নাজদী দাওয়াহ সম্পর্কে মুরজিয়্যাদের মিথ্যাচার

كسر درع المشركين

মুশরিকদের ঢাল ভেঙে দেওয়া

বড় শিরকের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার মিথ্যা অজুহাত খণ্ডন

AHLUL HAQQ
publications

নাজদী দাওয়াহ সম্পর্কে মুরজিয়্যাদের মিথ্যাচার

১৪৪৮ হিজরি
অনুবাদ ও প্রকাশণায়:

AHLUL HAQQ
publications

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তাঁর সর্বশেষ রাসূল তার পবিত্র পরিবার, তার সম্মানিত সাহাবীগণ ও কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠভাবে তাদের পথ অনুসরণকারীদের ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। অতঃপর...

আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, যখন শিরক ও কুফর মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন তাওহীদ ক্রমশ 'গারীব' (অপরিচিত ও বিরল) হয়ে যাচ্ছে। এমনকি যারা নিজেদেরকে সত্য ও তাওহীদের ওপর দাবি করে, তাদের অনেকেই আর এর প্রকৃত অর্থ বোঝে না। কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে তা হলো একটি ঘটনা— আমি একবার কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করি, যারা একটি প্রসিদ্ধ মসজিদের সঙ্গে যুক্ত। আমরা যখন তাওহীদ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন আমি অত্যন্ত অদ্ভুত কথা শুনলাম। এরা এমন লোক যারা নিজেদেরকে নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসারী বলে দাবি করে এবং সালাফে সালিহীনদের অনুসরণকারী বলে পরিচয় দেয়। অথচ তারা বলল যে, একজন মুসলিম মুওয়াহহিদ ব্যাক্তি বড় শিরক—যেমন কবর, গাছ, পাথর, গ্রহ-নক্ষত্র, ফেরেশতা, জিন এমনকি শয়তানকেও ইবাদত করলেও তার অজ্ঞতার কারণে সে মুসলমানই থাকবে! তাই আল্লাহর কাছে দয়া প্রার্থনা করো, তারপর আল্লাহর কাছেই সুস্থ ও সঠিক বুদ্ধির দোয়া করো। এই উম্মতের মধ্যে কুফরের শিকড়

কত গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে তা ভেবে দেখো! কেননা যদি এ ধরনের লোকেরা এই দেশের 'ধর্মীয়দের' অন্তর্ভুক্ত হয় (অর্থাৎ যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে, দারসে অংশ নেয় ইত্যাদি), তাহলে সেই সাধারণ মানুষদের অবস্থা কী হবে, যারা কেবল নিজেদের ইসলামি পরিচয়েই সীমাবদ্ধ?

আর যদি এই লোকেরা — এবং যারা তাদের মতো একই ভ্রান্ত মত পোষণ করে — নিজেদের ফিতরাতের (প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির) প্রতি বিশ্বস্ত থাকত, তবে তারা কখনোই কোনো মুশরিককে মুওয়াহহিদ হিসেবে ওজর দিত না। কিন্তু তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং আমাদের দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়া শুভহাত (সন্দেহজনক যুক্তি ও বিভ্রান্তি) দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করে, যাদেরকে তারা জ্ঞানী মনে করে। কিন্তু বলো তো, তাওহীদের মূল ভিত্তি না বুঝলে দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান তোমার কী উপকারে আসবে?

নিশ্চয়ই আমাদের এই যুগে এমন বহু বই প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বড় শিরককারী অজ্ঞ ব্যক্তিকে ওজর দেওয়া বিষয়ে লেখা হয়েছে। অথচ এসব বই প্রাচীন উলামাদের ইজমা (ঐকমত্য)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তবু এই ভ্রষ্ট বইগুলো নিজেদেরকে প্রসিদ্ধ আলেমদের নামের আড়ালে লুকিয়ে রাখে, অথচ ঐ আলেমগণ এসব বিকৃত চিন্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সুতরাং এই লেখার উদ্দেশ্য হলো — মহান আলেমদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা, এবং এই বিষয়ে আধুনিক গবেষক নামধারী ব্যক্তিদের ভুলগুলো ব্যাখ্যা করা। এরা হলো এমন কিছু মানুষ, যারা নিজেদেরকে "তালিবুল ইলম" (জ্ঞান অন্বেষণকারী) মনে করে, এবং আলেমদের বই পড়ে; কিন্তু তারা কুরআন

ও সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং আমাদের সময়ের আহলুল বিদআহ (বিদআতপন্থী)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে পড়াশোনা করে।
অতএব, আমি আল্লাহর কাছে তাওফিক প্রার্থনা করছি — যেন তিনি এই লেখাটিকে এমন একটি তরবারি বানান, যা মুশরিকদের ঢাল ভেঙে দেবে। অর্থাৎ, সেই বিভ্রান্তিকর যুক্তি ও অজুহাতগুলো ধ্বংস করবে, যেগুলোর মাধ্যমে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের তাকফির থেকে রক্ষা করা হয়।

প্রথম ভুল: আলেমদের বক্তব্যকে ভুলভাবে বোঝা

জেনে রাখো — আল্লাহ যেন তোমাকে সেই পথে অটল রাখেন যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে — অনেক লেখক এমন বই রচনা করেছেন যেখানে তাঁরা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله-এর বক্তব্যসমূহের উপর নির্ভর করেছেন, বিশেষত 'অজ্ঞতার অজুহাতের' বিষয়ে।
লেখক হয়তো ইমামের কোনো বক্তব্য পেয়েছেন যেখানে তিনি অজ্ঞতার প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন, কিন্তু তিনি সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গ বা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ না দেখে, শুধুমাত্র নিজের ইজতিহাদ (ব্যক্তিগত বোঝাপড়া)-এর উপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণ বই লিখে ফেলেন।[1]
এরপর আধুনিক গবেষকগণ ইমামের কিছু উক্তি পান যেখানে ইমাম কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিকে ওজর দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তারা সেই বক্তব্যকে ভুলভাবে নিজেদের বইতে লেখেন এবং প্রচার করেন যে — অজ্ঞ ব্যক্তিকে সবক্ষেত্রেই ওজর দেওয়া হবে।

[1] তার নিজের বুঝ অনুযায়ী এবং আজকের যুগে তার সমমনা লোকদের বুঝ অনুযায়ী, পূর্ববর্তী আলেমদের বুঝ অনুযায়ী নয়।

এভাবে তার এই জনপ্রিয় মতামত আমাদের এই যুগে—যে যুগে পাপ ও কুফরের প্রতি সহনশীলতা বিস্তৃত হয়েছে—আগুনের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কেননা আজকাল অনেক মানুষ এমন এক অজুহাতের খোঁজে থাকে যা তাদের কাফিরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং তাদের আচরণ অনুসরণ করার অনুমতি দেয়।

এখানেই গবেষকের ভুল নিহিত রয়েছে, যখন সে আলেমদের বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করে, তখন ভুলভাবে মনে করে যে পূর্ববর্তী আলেমগণ অজ্ঞতার সব ক্ষেত্রেই ওজর দিতেন। সে যখন এমনটি পড়ে বা বিশ্বাস করে, তখন একই আলেমের অন্য বক্তব্যগুলো উপেক্ষা করে ফেলে—যেসব বক্তব্যে তিনি অজ্ঞতাকে অজুহাত হিসেবে গণ্য করেননি।
এমন গবেষকের অবস্থা ঠিক সেই মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতো, যারা ক্ষমার কথা বলা নস গ্রহণ করে, কিন্তু শাস্তির নস উপেক্ষা করে। খারিজিরাও এরকম, যারা কেবল শাস্তির বক্তব্যগুলো গ্রহণ করে, কিন্তু ক্ষমার বক্তব্যগুলো উপেক্ষা করে। আর আল্লাহ আহলুস সুন্নাহকে বরকত দিন—তারা উভয় দিকের নসের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন, ফলে তারা একটি সত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ আক্বীদাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

সুতরাং একদিকে আমরা দেখি, কিছু গবেষক ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله-এর এমন বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যেখানে তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিকে ওজর দিয়েছেন; আবার অন্যদিকে কিছু গবেষক তাঁর এমন বক্তব্য উল্লেখ করেন যেখানে তিনি অজ্ঞতাকে কোনো অজুহাত হিসেবে স্বীকার

করেননি। ফলে আমরা এমন কিছু বইও দেখতে পাই যেখানে বলা হয় যে, সালাফ আলেমগণ কোনো ক্ষেত্রেই অজ্ঞতাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেননি।[2] কিন্তু প্রকৃত ও ভারসাম্যপূর্ণ সত্য পাওয়া যাবে তখনই, যখন আমরা নিচের বিষয়গুলো একত্রে বিবেচনা করব—

1 যে বিষয়গুলোয় আলেমগণ অজ্ঞতাকে ওজর বলেছেন — সে সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহ।

2 যে বিষয়গুলোয় আলেমগণ অজ্ঞতাকে ওজর বলেননি — সে সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহ।

আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে—আমাদের উচিত আলিমদের[3] বক্তব্যগুলোকে তাদের প্রকৃত প্রেক্ষাপটে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা।

ফলত, গবেষক ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله-এর এমন কিছু বক্তব্য পাবেন, যেখানে তিনি অজ্ঞতাকে কোনো অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেননি, যেমন তাঁর গ্রন্থ কিতাব আত-তাওহীদ-এ তিনি স্পষ্টভাবে বলেন: “তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিকে ওজর দেন না।”

আর কাশফ আশ-শুবুহাত-এ তিনি বলেন: “একজন ব্যক্তি অজ্ঞ থাকাকালীন তার জিহ্বা থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র একটি কথার দ্বারাই কাফের হয়ে যেতে পারে”।

অন্যদিকে, ইমামের এমন কিছু বক্তব্যও রয়েছে যেখানে তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিকে ওজর দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন: “আমার সম্পর্কে শত্রুরা যে কথা

---

[2] ভুলটা এখানে এই যে, গবেষক ঐ একই আলেমদের অন্যান্য বক্তব্য উপেক্ষা করেছেন—যেখানে তারা অজ্ঞতাকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

[3] আমরা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব এবং আরও অনেকের বক্তব্য থেকে উদাহরণ দেখব।

বলে—যে আমি সন্দেহের ভিত্তিতে তাকফির করি, বা এমন অজ্ঞ ব্যক্তিকে কাফির বলি যার কাছে দলিল (হুজ্জাহ) পৌঁছেনি—এটি এক বড় মিথ্যা। এর মাধ্যমে তারা (শত্রুরা) মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বীন থেকে দূরে রাখতে চায়।"[আর-রাসাআইল আশ-শাখসিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৫]

তাহলে প্রশ্ন আসে — ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله কি অজ্ঞ ব্যক্তিকে ওজর দিতেন, না কি দিতেন না?
এর উত্তর হলো — একজন নিরপেক্ষ ও আন্তরিক গবেষক ইমামের সব বক্তব্য তাঁর প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করবে, এবং এরপর নির্ধারণ করবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইমাম অজ্ঞতাকে ওজর হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে করেননি।
কারণ, ইমাম এমন মত পোষণ করেননি যে— সব ধরনের অজ্ঞতাই ওজরযোগ্য, কিংবা কোনো অজ্ঞতাই ওজরযোগ্য নয়। বরং তাঁর মতামত ছিল—কিছু ক্ষেত্রে অজ্ঞতাকে ওজর দেওয়া হয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না।

প্রথম উদাহরণ: ইমাম رحمه الله সূরা আল-হিজর-এর কিছু আয়াতের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, চতুর্থ উপকারিতার অধীনে বলেন: "অজ্ঞ ব্যক্তি ওজরপ্রাপ্ত নয়, কারণ সে জিজ্ঞাসা করতে (সত্য জানতে) সক্ষম।"

সুতরাং, এই উদাহরণ অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে, যে অজ্ঞ ব্যক্তিকে ওজর দেওয়া হয় না, সে হলো সেই ব্যক্তি — যার জিজ্ঞাসা করার (অর্থাৎ জ্ঞান অনুসন্ধানের) সক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সে কোনো না কোনো কারণে তা করে না।

অজ্ঞদের বিভিন্ন শ্রেণি—কে ওজরপ্রাপ্ত আর কে ওজরপ্রাপ্ত নয়—এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "তারীক আল-হিজরাতাইন"-এ। তিনি "তাবাকাত আল-মুকাল্লাফীন" অধ্যায়ে বলেন: হ্যাঁ, এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।
আর তা হলো—একজন মুকাল্লিদ, যার কিছুটা জ্ঞান রয়েছে এবং সে সত্যকে চিনেছে কিন্তু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আরেকজন মুকাল্লিদ, যার কোনো জ্ঞানই নেই — এ দুজনের মধ্যে পার্থক্য। উভয়ই আলোচনার আওতায় পড়ে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্য রাখে কিন্তু তা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর কাছে তার কোনো অজুহাত নেই, কারণ সে এমন একটি কাজ ত্যাগ করেছে যা আল্লাহ তার উপর ফরজ করেছেন — অর্থাৎ, জ্ঞান অনুসন্ধান করা। আর যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে অক্ষম, তারা দুই প্রকারের: এক প্রকার হলো সেই ব্যক্তি, যে আন্তরিকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে চায় এবং সত্যের অনুসন্ধান করে, কিন্তু তা করতে অক্ষম। তার অবস্থা সেইসব লোকদের মতো, যারা ফিতরাতের উপর আছে বা যাদের কাছে রাসুলের দাওয়াত পৌঁছেনি। দ্বিতীয় প্রকার হলো সে ব্যক্তি, যে না জানতে চায়, না জিজ্ঞেস করে, না সত্যের দিকে মনোযোগ দেয়, বরং নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে এবং সত্য অনুসন্ধানের কোনো চেষ্টা করে না।

প্রথম শ্রেণির ব্যক্তি বলে: “হে আল্লাহ! যদি আমি জানতাম যে আমার বর্তমান ধর্মের চেয়ে উত্তম কোনো ধর্ম রয়েছে, তবে আমি তা গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমি তা জানি না, এবং তা জানারও কোনো উপায় আমার নেই।”
এই দুইজনই কোনো না কোনোভাবে অক্ষম, তবে তারা সমান নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله তাঁর গ্রন্থ মুফীদ আল-মুস্তাফিদ-এ বলেন: আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে উমর ইবনু আবাসাহ আস-সুলামি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন: “আমি জাহেলিয়্যাত যুগে মনে করতাম যে মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে, এবং তারা সত্যের উপর নেই, কারণ তারা মূর্তিগুলোর উপাসনা করতো। একদিন আমি মক্কায় এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম। তখন আমি তাঁর কাছে পৌঁছালাম। আমি দেখলাম — তিনিই আল্লাহর রাসূল ﷺ, এবং তাঁর জাতি তাঁকে আড়াল করেছে (অর্থাৎ, তিনি গোপনে দাওয়াত দিচ্ছিলেন)। আমি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর কাছে পৌঁছে বললাম:
“আপনি কে?”
তিনি বললেন: “আমি একজন নবী।”
আমি বললাম: “নবী মানে কী?”
তিনি বললেন: “আমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন।”
আমি বললাম: “আল্লাহ আপনাকে কী বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন?”

তিনি বললেন: "তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, মূর্তি ভেঙে ফেলতে এবং আল্লাহর ইবাদত কেবল তাঁরই জন্য খালিস রাখতে — যাতে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা না হয়।"

ইমাম رحمه الله এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর এর থেকে কিছু উপকারিতা তুলে ধরে বলেন, "মুসলমান যেন এই হাদীসের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে। কারণ আল্লাহ আমাদের নিকট নবী ও তাঁদের অনুসারীদের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, যাতে পরবর্তী যুগের মুসলিমরা তাদের সঙ্গে নিজেদের মিল খুঁজে নিতে পারে। আর আল্লাহ আমাদের নিকট কাফির ও মুনাফিকদের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, যাতে আমরা তাদের ভুল ও গাফেলতিগুলো থেকে সাবধান হতে পারি। এই হাদীসের প্রজ্ঞার একটি দিক হলো— সেই অজ্ঞ আরব (অর্থাৎ উমর ইবনু আবাসাহ رضي الله عنه) যখন শুনলেন যে মক্কায় এমন একজন মানুষ আছেন যিনি ধর্ম বিষয়ে লোকদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) বিরোধিতা করছেন, তখন তিনি কোনো দ্বিধা করেননি; বরং দ্রুত তাঁর (রাসূল -ﷺএর) কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করলেন, কারণ তাঁর হৃদয়ে ছিল দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা। আর আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে বলেন: "আর আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু জানতেন তবে তিনি তাদেরকে শুনাতেন।" (অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক দ্বীনের উপর স্থির রাখতেন, আর 'শুনাতেন' অর্থ হলো— তাদের বুঝিয়ে দিতেন।) সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, আজকের দিনে মানুষের মধ্যে যে অজ্ঞতা ও অনুধাবনের অভাব দেখা যায়— তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ন্যায়সঙ্গত শাস্তি, কারণ তাদের হৃদয় কলুষিত এবং তাদের মধ্যে আন্তরিকতার

অভাব রয়েছে। এখন যদি একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, যিনি সত্য জানতেন না, তবুও তা অনুসন্ধানে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন— তাঁর অবস্থা এমন হয়, তবে আজ যারা নবীদের অনুসারী হওয়ার দাবি করে, নবীদের বাণী বর্ণনা করে, অথচ তাদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা শেখাতে পারে, তবুও তারা নিজেরা শেখার কোনো চেষ্টা করে না তাদের অবস্থা কেমন হবে? আর যদি কখনও তারা শোনার উদ্দেশ্যে আসে, তাহলে তারা আসে অনীহা ও গাফেলতার সাথে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে নতুন কোনো উপদেশ এলেই তারা তা খেলাচ্ছলে শোনে; তাদের হৃদয় থাকে উদাসীন।"[সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২–৩] [মূল: "মুফীদ আল-মুস্তাফীদ", পৃষ্ঠা ২৮৩–২৮৪]

দ্বিতীয় উদাহরণ: তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) সূরা আল-হিজরের আয়াতসমূহের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "আল্লাহর বাণী, 'যখন তোমরা উপলব্ধি করো না (বা অনুভব করো না)', এর অর্থ হলো—'যখন তোমরা অজ্ঞ থাকো'। এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। কারণ বহু বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।"[4] (দেখুন: تفسير آيات من القرآن الكريم পৃ. ৩৫০)
"কারণ বহু বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়"— তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, অজ্ঞ মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এক ধরনের

[4] অন্য জায়গায় তিনি উসূল আদ-দ্বীন বিষয়ে যাকে অজ্ঞতার ওজর দেওয়া হয় না, তার সঙ্গে সেই ব্যক্তির পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন যে কোনো দূর-নির্জন এলাকায় বাস করে, বা নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিংবা এমন বিষয়ে যেখানে বিষয়টি গোপন বা সূক্ষ্ম।

অজ্ঞ ব্যক্তি এমন, যার জন্য জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে জ্ঞান অন্বেষণ করে না। তাই সে ওজরপ্রাপ্ত নয়। অন্য ধরনের অজ্ঞ ব্যক্তি এমন, যে আন্তরিকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলেও তা অর্জন করতে সক্ষম নয়। তাই সে (আখিরাতে) ওজরপ্রাপ্ত।

আর ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله আল-হাশিয়াহ গ্রন্থে বলেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা করে না, আল্লাহ তাকে ওজর দেবেন না। আর যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে অক্ষম, সে দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার হলো, যে জ্ঞান অর্জন করতে চায় এবং সত্যকে ভালোবাসে, কিন্তু তার পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের অজ্ঞ ব্যক্তির বিধান আহলুল ফাতরাহ এবং যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি—তাদের মতো।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, যে ব্যক্তি সত্য অনুসন্ধান করতে না সক্ষম, না আগ্রহী। বরং সে যে অবস্থার ওপর আছে, তাতেই সন্তুষ্ট। (অর্থাৎ, জ্ঞান তার নাগালে এলেও সে তা অন্বেষণ করত না)।"

উল্লেখ্য, যদিও আহলুল ফাতরাহ-কে দুনিয়ার বিধানের দৃষ্টিতে মুসলিম গণ্য করা হয় না, তবুও আখিরাতে আল্লাহ তাদের ওজর গ্রহণ করতে পারেন।

ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله এভাবেই স্পষ্ট করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি ওজরপ্রাপ্ত হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ওজরপ্রাপ্ত হয় না।

শায়খ ইসহাক বিন আবদুর রহমান বিন হাসান رحمه الله বলেন: "আমরা বলি: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের

শায়খগণ যা বলেছেন, আমরা তার বাইরে কিছু বলি না। যেমন আমাদের শায়খ মুহাম্মাদ (ইবনে আবদুল ওয়াহহাব) তাঁর ইফাদাতুল মুস্তাফীদ গ্রন্থে বলেছেন, এবং তাঁর প্রপৌত্র ইরাকির (দাউদ বিন জিরজিস—যিনি কবরপূজারীদের ওজর দিতেন) খণ্ডনে যা বলেছেন। একইভাবে, তাঁদের পূর্ববর্তী এ দ্বীনের আলিমদেরও এটাই বক্তব্য। আর এটি ইসলামের এমন বিষয়, যা দ্বীনের অপরিহার্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়সমূহ কেবল কুরআন, সুন্নাহ এবং আলিমদের ইজমা থেকেই গ্রহণ করা হবে। কোনো একক আলিমের ব্যক্তিগত মতামত থেকে নয়।" حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

—

আমি বলছি: যদি সত্যিই আমরা উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়ে আমাদের দলিল কেবল কুরআন, সুন্নাহ এবং আলিমদের ইজমা থেকেই গ্রহণ করি, তবে আমাদের সেদিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত; আমাদের নিজেদের ইজতিহাদ বা বর্তমান যুগের বহু তথাকথিত "আলিম"-এর ইজতিহাদের দিকে নয়। নিশ্চয়ই মুশরিকদেরকে তাদের অজ্ঞতার কারণে কখনোই ওজর দেওয়া হয়নি—না কুরআনে, না সুন্নাহতে এবং না সাহাবাদের মধ্যে।

এ বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله-এর নামে আরোপিত মনগড়া কথা ও মিথ্যা বর্ণনাগুলো বিভ্রান্তির একটি বড় উৎস। এসবের মধ্যে এমন দাবিও রয়েছে যে, তিনি কবরপূজারীদেরকে অজ্ঞতার কারণে ওজর দিতেন। নিচে এর একটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

[মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের একই চিঠির দুটি সংস্করণ। মূল চিঠিটি তাঁর প্রপৌত্র ‘আবদুল লাতীফ আলে আশ-শাইখ رحمه الله-এর গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর বিকৃত সংস্করণটি আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে লক্ষ্যণীয় যে, আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ-এর সবকিছুই বিকৃত নয়; এটি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত লেখাসমূহের একটি সংকলন।]

কোনো ছাত্র বা গবেষক যদি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের নামে প্রচারিত ওই বিকৃত চিঠিটি পড়ে, তবে অতিরিক্ত অনুসন্ধান ছাড়াই অন্ধ অনুসারীর মতো সেটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু যদি সে জানে যে, সালাফগণ বড় শিরকের ক্ষেত্রে কখনো ওজর দিতেন না, তবে সে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করবে এবং মূল, অবিকৃত চিঠিটি খুঁজে পাবে, যেখানে শাইখ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আরব উপদ্বীপের কবরপূজারীদের তাকফির করেছিলেন।

অতএব, বর্তমান যুগের বহু গবেষকের মধ্যে প্রচলিত প্রথম সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে উপসংহার হলো: এ কথা বলা ভুল যে, আলিমগণ সব বিষয়ে অজ্ঞতাকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেন। একইভাবে এ কথাও ভুল যে, তাঁরা কোনো বিষয়েই অজ্ঞতাকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেন না। বরং আলিমগণ কিছু বিষয়ে অজ্ঞতাকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আবার কিছু বিষয়ে—বিশেষত উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়গুলোতে—অজ্ঞতাকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেননি।

এই ভুল ধারণা আরও সহজে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আলিমদের নামে আরোপিত বিকৃত ও জাল বর্ণনার কারণে। তবে যে আন্তরিক জ্ঞানার্থী সর্বাগ্রে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভর করে, সে এসব জাল ও বিকৃত বর্ণনার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হবে না। আর সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই।

দ্বিতীয় ভুল (উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়সমূহে):

এ বিষয়ে আরেকটি ভুল[5], যা সাধারণভাবে করা হয়, তা হলো: "এই বিষয়টি কি উসূলুদ-দ্বীনের (ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অর্থাৎ যাকে আলিমগণ 'মুসলিম হওয়ার জন্য অপরিহার্যভাবে জানা আবশ্যক' বলে উল্লেখ করেন) অন্তর্ভুক্ত?" কারণ, উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়সমূহে অজ্ঞতার কোনো ওজর নেই। আর উসূলুদ-দ্বীনের বাইরে অন্য বিষয়গুলোতে ওজর থাকতে পারে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব এ বিষয়টি রাসাইল আশ-শাখসিয়্যাহ (১/২৪৪)-এ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"যার ওপর এখনো হুজ্জাহ (দলিল) প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে হলো এমন ব্যক্তি, যে সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে, অথবা এমন ব্যক্তি, যে কোনো দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে; অথবা এমন গোপন ও সূক্ষ্ম বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেমন আস-সারফ ও আল-'আতফ। এ ধরনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তিকে তাকফির করা হবে না, যতক্ষণ না তার কাছে হুজ্জাহ (দলিল) স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। আর উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়গুলো, যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন—সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুজ্জাহ হলো কুরআন।[6] সুতরাং যার কাছে কুরআন পৌঁছেছে, তার কাছে হুজ্জাহও পৌঁছে গেছে..."

---

[5] তা হলো অজ্ঞতার ওজর।

[6] আর যাদের কাছে কুরআন পৌঁছেনি এবং যাদের পক্ষে কুরআন সম্পর্কে জানা সম্ভবও ছিল না, তারা আহলুল-ফাতরাহর অন্তর্ভুক্ত। তারা দুনিয়ার বিধান অনুযায়ী মুসলিম হিসেবে গণ্য নয়; তবে আখিরাতে তাদের ক্ষমা করা হতে পারে।

অতএব, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, আপনি তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে, তিনি সুস্পষ্ট বিষয়সমূহ (উসূলুদ-দ্বীন) এবং গোপন বা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাই তিনি এ দুই ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিধান প্রদান করেছেন।

কিন্তু অনেক গবেষক বা জ্ঞান দাবি করেন এমন ব্যক্তি এই পার্থক্যটি বুঝতে ব্যর্থ হন।বতারা আলিমদের গ্রন্থে পড়েন যে, অজ্ঞতার ওজর রয়েছে; কিন্তু তারা উপলব্ধি করেন না যে, এটি উসূলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেমন তাওহীদ। কারণ, উসূলুদ-দ্বীন মূলত একজন ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার প্রাথমিক শর্ত।

এরপর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله, ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله-এর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, তিনি যারা তাকফিরের উপযুক্ত, তাদের ব্যাপারে বিলম্ব না করে তাকফির করতেন।

"... যদি তিনি (ইবনে তাইমিয়্যাহ) এ বিষয়ে ভুল করে থাকেন, অথবা তাঁর চেয়েও উত্তম কোনো আলিম ভুল করে থাকেন—অর্থাৎ সেই মুসলিম সম্পর্কে, যে তার কাছে হুজ্জাহ পৌঁছার পর শিরক করে; অথবা সেই মুসলিম সম্পর্কে, যে এ বিধান মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করতে চায় বা একে সত্য বলে দাবি করে; কিংবা এ ধরনের অন্যান্য সুস্পষ্ট কুফরের ব্যাপারে, যা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আলিমগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন—তবে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন, তার ভিত্তিতেই তাকফিরে (এ ধরনের ব্যক্তিদের) বিশ্বাস করি।

আর যদি কেউ এ বিষয়ে ভুল করে (অর্থাৎ বলে যে, মুশরিকদের তাকফির করা সঠিক নয়), তবে—সকল প্রশংসা আল্লাহরই—আমরা এমন কোনো আলিমকে জানি না, যিনি তাকফিরের এই মূলনীতির বিরোধিতা করেছেন। অতএব, সে ফিরআউনের সেই অজুহাতেরই আশ্রয় নিয়েছেন (যখন সে বলেছিল, "তাহলে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর অবস্থা কী?" ২০:৫১)
অথবা কুরাইশদের সেই অজুহাতের মতো ("এমন কথা তো আমাদের নিকট অতীতের মিল্লাতগুলো থেকে শুনিনি।" ৩৮:৭) – মুফীদ আল-মুস্তাফীদ, পৃষ্ঠা ২৯০।

সুতরাং এ কথা কোনো ওজর হতে পারে না যে, "আমরা মুশরিকদের তাকফির করি না; কারণ আমাদের নেতারাও তা করেন না।"
আর আলিম ইসহাক ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাসান رحمه الله বলেন: "আমাদের এ বিষয়টি হলো—আল্লাহর একক ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা এবং আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়, তার প্রতি সম্পর্কচ্ছেদ (তাকফির) ঘোষণা করা। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, সে অবশ্যই বড় শিরক করেছে, যা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এ (নীতি) হলো আসলুল-উসূল (ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের মূল ভিত্তি)। আর এটাই সেই বার্তা, যা নিয়ে রাসুল ও কিতাব প্রধানত প্রেরিত হয়েছে। আর রাসুল ও কুরআনের মাধ্যমে মানুষের ওপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" — حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

“এ (নীতি) হলো আসলুল-উসূল (ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের মূল ভিত্তি), আর এটাই সেই বার্তা, যা নিয়ে রাসুল ও কিতাব প্রেরিত হয়েছে”— শাইখের এ বক্তব্য থেকে আমরা বহু বিষয় উপকৃত হই। তার মধ্যে রয়েছে:
১. শুধু আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা—এটাই তাওহীদ ও ইসলামের প্রধান ভিত্তি।
২. আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতকে অস্বীকার (তাকফির) করা, এবং যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে সে বড় শিরক করেছে, যা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এটি শিরক প্রতিরোধের মূল বিষয়।

শাইখ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো: “কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া।” সুতরাং যার কাছে কুরআন ও সুন্নাহ পৌঁছেছে, তার কাছে হুজ্জাহও পৌঁছে গেছে। ইনশাআল্লাহ, এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা হবে।

এরপর এই বিষয়ে (অর্থাৎ অজ্ঞ হলেও কবরপূজারীদের তাকফির করা) কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো, যা ইমামদের ঐকমত্য প্রদর্শন করে।

আল-বারবাহারী رحمه الله বলেন: “আমরা কাউকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করি না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত অস্বীকার করে, অথবা রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত কোনো বিষয় অস্বীকার করে, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করে, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে সালাত আদায়

করে। যদি সে এর কোনোটি করে, তবে তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের বলে গণ্য করা তোমার জন্য ওয়াজিব। আর যদি সে এগুলোর কোনোটি না করে, তবে সে ইসলামের ওপর বিশ্বাসী একজন মুসলিম।" —শারহুস-সুন্নাহ, ৬৪।

আল-ক্বারাফী শারহু তানকীহিল উসূল (পৃ. ৪৩৯)-এ বলেন: "অতএব, ইজমা অনুযায়ী উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়সমূহে অজ্ঞতাকে আল্লাহ ওজর হিসেবে গ্রহণ করেন না।"

ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 'আর আপনি এর(কুরআন) দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করুন, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রব-এর কাছে সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ছাড়া তাদের জন্য থাকবে না কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী।'
এবং তিনি বলেছেন: 'বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে কর তাদেরকে ডাক, অতঃপর দেখবে যে, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার বা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।'
এবং তিনি বলেছেন: 'বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ দু'টিতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সহায়কও নয়।''
'আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।'

আর সালাফদের একদল বলেছেন: ‘‘কিছু সম্প্রদায় ছিল, যারা মাসীহ, উযাইর এবং ফেরেশতাদের ইবাদত করত। তখন আল্লাহ তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, ফেরেশতা ও নবীগণ তাদের কোনো ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা রাখেন না এবং কারো কোনো ক্ষতিও করতে পারেন না। বরং তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করেন, তাঁর রহমতের আশা করেন এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করেন।’’

আর আল্লাহ তা‘আলা বলেন: ‘কোনো ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, ‘আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও’, বরং তিনি বলবেন, ‘তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।’’

‘অনুরূপভাবে ফেরেশ্তাগণ ও নবীগণকে রবরূপ গ্রহণ করতে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবেন?’

অতএব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ফেরেশতা ও নবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করা কুফর।

সুতরাং, যে ব্যক্তি ফেরেশতা বা নবীদেরকে আল্লাহ ও নিজের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের কাছে দু’আ করে, তাদের ওপর ভরসা করে এবং তাদের কাছে উপকার বা ক্ষতি দূর করার আবেদন করে—যেমন তাদের কাছে নিজের গুনাহ মাফ চাওয়া, হিদায়াত চাওয়া বা বিপদ দূর করার প্রার্থনা করা—তবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির।

আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 'আর তারা বলে, 'দয়াময় (আল্লাহ্) সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।' —আল-ফাতাওয়া, ১/১২৪।

অন্যত্র তিনি বলেন: "মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হলো সেই ব্যক্তি, যে শিরক করে; অথবা রাসুলের প্রতি বা তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার কোনো কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে; অথবা অন্তরে মুনকারকে ঘৃণা করা পরিত্যাগ করে; অথবা মনে করে যে, সাহাবীগণ কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন, কিংবা তা সমর্থন করে; অথবা এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করে, যার ওপর সুস্পষ্ট ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; অথবা নিজের ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্থির করে—তাদের ওপর ভরসা করে, তাদের কাছে দু'আ করে এবং তাদের নিকট প্রার্থনা করে…" – আল-ইখতিয়ারাত, পৃ. ৩০৭।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله ইসলামের দশটি নাওয়াক্বিদ (ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়)-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন:
"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও নিজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন করে, তাদের নিকট দু'আ করে, তাদের কাছে শাফাআত প্রার্থনা করে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে—সে ইজমা অনুযায়ী কাফির হয়ে যায়।" —আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ২/৩৬১
আর শায়খ আবদুল লাতিফ رحمه الله (যিনি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله-এর প্রপৌত্র)—বলেন:

“এটি আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাহ, রাসূলের সাহাবীগণের বক্তব্য এবং তাঁদের পরবর্তী আহলুল ইলমের বক্তব্য—সবই আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। তাঁরা শিরককে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন: বড় শিরক এবং ছোট শিরক।

আর যে মুশরিক বড় শিরকে লিপ্ত হয়, তার হুকুম হলো—সে কাফির। এই বিধান উম্মাহর নিকট সুপরিচিত। এ বিষয়ে কেবল সেই অজ্ঞ ব্যক্তিই বিরোধিতা করে, যে জানে না মানুষের জন্য তাদের দ্বীনের কী দাবি রয়েছে এবং রাসূলগণ কী বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

এটি কোনো একক আলিমের মত নয়; বরং এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। এটি ইসলামের এমন মৌলিক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা জানা অপরিহার্য, যা বলেছেন তাক্বী উদ-দ্বীন ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম আয-জাউযিয়্যাহ, ইবনে উক্বাইল আল-ফাতাওয়া আল-বাজ্জাযিয়্যাহ-এর রচয়িতা, সানাউল্লাহ হালাবী, আল-মাকরিযি আশ-শাফি’ঈ, মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-নুমি, আল-যুবাইদি, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-সান’আনি, মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি এবং আরও বহু আহলুল ইলম।” —মিসবাহ আয-যুলাম, ১/৫২

তিনি رحمه الله আরও বলেন: “বরং সমস্ত দলিল ও নস একমত যে, মৃতদের কাছে দু‘আ করা এবং তাদেরকে আহ্বান করা শিরক। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে, সে নিকৃষ্টের চেয়ে নিকৃষ্টতম।

যে ব্যক্তি তার রবের সাথে অন্যকে শরীক করে এবং ইবাদতে আল্লাহ ও নিজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ও অংশীদার স্থাপন করে, তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়। এবং ইবনুল কাইয়্যিম আয-যাউজি স্পষ্ট করেছেন যে এটি হারাম এবং

শিরকে আকবারের অন্তর্ভুক্ত, যেমন ইগাসা আল-লাহফান ও অন্যান্য গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর ইবনে উক্বাইল এমন যে কাউকে তাকফির করেছেন যে মৃতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। এ বিষয়ে আহলুল ইলমের কারও কোনো মতভেদ নেই।" —মিসবাহ আয-যুলাম, ৩/৩৯৩

তিনি আরও বলেন: "শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব আহলুল ইলমেরই একজন; তিনি আহলুল ইলমের বিরুদ্ধে যাননি। মৃতদের নিকট প্রার্থনা করার বিষয়টি এমন একটি সুস্পষ্ট বিষয়, যাতে উম্মাহর আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। আর শাইখুল ইসলাম তাদের কুফর স্পষ্ট করেছেন, যারা আল্লাহ ও নিজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন করে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে।

আর তিনি খ্রিস্টানদের জবাবে বলেছেন যে, সকল নবী-রাসূল এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, মৃতদের কাছে প্রার্থনাকারীকে কাফির গণ্য করা হবে এবং এ ধরনের ইবাদতের একমাত্র হক্বদার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন।" — মিসবাহ আয-যুলাম, ৩/৪৪৭

আর তিনি (শাইখ আবদুল লাতিফ رحمه الله) আরও বলেন: "তোমাদের এই বিষয়টি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কবর ও মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনাকারী যাদেরকে আমাদের শাইখ (মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব) কাফির বলেছেন তারা নাকি মুসলিম মুমিন, এবং তাদের গুনাহ ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এটিই আপত্তিকারীর (যে তাকফীর করে না) ভ্রান্ত মত।

আর এ কারণেই তিনি আবু আব্বাস -এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যাতে তার ভুল স্পষ্ট হয়।

কারণ এই (ভ্রান্ত) মতের সারকথা হলো, যে ব্যক্তি কবরপূজারীদের তাকফীর করে, সে এমন মুসলিমদের তাকফীর করেছে, যাদের সেই গুনাহ (অর্থাৎ শিরক) ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, সকল আহলুল ইলম এ ধরনের মুশরিকদের তাকফীর করেছেন। বরং এ বিষয়ে নবী-রাসূলদের ইজমাই যথেষ্ট প্রমাণ।

শাইখুল ইসলাম আবু আল-আব্বাস তার মাযহাবের বিশিষ্ট আলিমদের থেকে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও নিজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন করে, তাদের নিকট প্রার্থনা করে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে, সে ইজমার ভিত্তিতে কাফির।"

কারণ সে মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনাকারীদের কাজই করেছে; যারা বলত: "আমরা তো তাদের ইবাদত করি শুধু এ জন্য যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৩)

আর ইবনে হাজার আশ-শাফি'ঈ إعلام بقواطع الإسلام গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ফকীহগণ রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ)-এর অধ্যায়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ-সংক্রান্ত শিরকের বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

"যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝবে, সে বুঝতে পারবে যে, মুশরিকদের ওজর দেওয়া ব্যাক্তি নিজেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, কারণ সে মুশরিকদের মুসলিম বলে গণ্য করছে। বরং (মুশরিকদের তাকফীর করতে অস্বীকার করে) সে যেন এ কথা বলছে যে, মুসলিমগণ এবং সম্মানিত রাসূলগণ (মুশরিকদের তাকফীর করার ক্ষেত্রে) ভুল ছিলেন।" – মিসবাহ আয-যুলাম, ৩/৫২৭–৫২৮

তিনি (শায়খ আবদুল লাতিফ رحمه الله) আরও বলেন (অজ্ঞ মুশরিককে ওজরদানকারী আস-সাহহাফ-এর জবাবে) :

“এই জাহিল সাহহাফ মনে করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, আল্লাহর সাথে মধ্যস্থতাকারী ও উপাস্য স্থাপন করে, তাদের নিকট সাহায্য ও বিপদমুক্তি প্রার্থনা করে—সে শাহাদাতাইন (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করার কারণে মুসলিম। তার শাহাদাহকে বাতিলকারী বিষয় তার ওপর প্রযোজ্য নয়, ফলে সে কাফিরও নয়।

অতএব, যে ব্যক্তি এমন অজ্ঞ মুশরিককে তাকফীর করে, সে না কি গুলাত। অথচ এ বক্তব্য আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাহ এবং উম্মাহর ইজমার সুস্পষ্ট বিরোধী।

ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও নিজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন করে, তাদের নিকট দু‘আ করে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে, সে ইজমার ভিত্তিতে কাফির।” — আস-সাহহাফের প্রতি আবদুল লাতীফের জবাব: ৪৪

“আবদুল লতীফ رحمه الله-এর পুত্রগণ—শায়খ ‘আবদুল্লাহ ও শায়খ ইবরাহীম—এবং শায়খ সুলাইমান ইবনু সাহমান বলেছেন: “যে ব্যক্তি জাহমিয়্যাদের ও কবরপূজারীদের তাকফীর করে না, অথবা তাদের কুফর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তার ইমামতি (নেতৃত্ব) সহীহ নয়। এ বিষয়টি ইলমের ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।”

তারা তাদের শাইখ (আবদুল লাতীফ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে আরও বলেন:

“অনুরূপভাবে, যে ব্যাক্তি ইমানের সামান্যতম ঘ্রাণও আস্বাদন করেছে, সে ব্যাতিত কবরপূজারীদের কুফর সম্পর্কে আর কেউ সন্দেহ করে না।“

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله উল্লেখ করেছেন যে, কুফর সংঘটিতকারী কথা বা কাজের ক্ষেত্রে তাকফীর না করার বিষয়টি কেবল সেই গোপন বা অস্পষ্ট মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে, যেখানে দলিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছেনি। সুতরাং, দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অজ্ঞ ব্যক্তিকে তাকফীর করা হবে না এবং শাস্তিও দেওয়া হবে না। আর এটি কেবল সেসব বিষয়ে, যেগুলোতে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কিন্তু সালেহীন (মৃত নেককার) ব্যক্তিদের নিকট দু'আ করা এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, তাহলে এটি এমন বিষয়, যার হারাম হওয়া এবং এটি যে শিরকে আকবার—এ বিষয়ে কোনো মুসলিমেরই সন্দেহ নেই। তাই এ ধরনের ব্যক্তিদের কুফর এবং জাহমিয়্যাদের কুফর সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই।

আর আমাদের যুগের ইবাদিয়্যাহ সম্প্রদায় তাদের পূর্ববর্তীদের দলের মতো নয়। তাদের সম্পর্কে আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো, তাদের ধর্ম কবরপূজারীদের ধর্মে পরিণত হয়েছে এবং তারা এমন সব কুফরী কাজে লিপ্ত হয়েছে, যার বিস্তারিত আলোচনা এখানে দীর্ঘ হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি তাদের অনুরূপ অবস্থায় রয়েছে, তার কুফর সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তাদেরকে মুসলিম মনে করে কেবল সেই ব্যক্তি, যার বুদ্ধি বা দ্বীনে বিপর্যয় ঘটেছে। আর যারা এসব নাস্তিকের (অর্থাৎ যারা নিজেদের প্রবৃত্তির ইবাদত করে) তাকফীর করে না অথবা তাদের কুফর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ নয়।” — আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ৪/৪১০

অতএব, উসূলুদ-দ্বীনের বাইরের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কাছে হুজ্জাহ (প্রমাণ) ব্যাখ্যা করে পৌঁছানো সম্ভব না হলে তাকে ওজরপ্রাপ্ত গণ্য করা হবে। আর উসূলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে যার কাছে কুরআনের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাকে আহলুল ফিতরাহর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হবে। আখিরাতে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আবার চাইলে ক্ষমা নাও করতে পারেন (তবে দুনিয়ার বিচারে সে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করে, তাহলে সে মুশরিক-কাফির হিসেবেই গণ্য হবে)।

আর এখান থেকেই আমরা তৃতীয় ভুলের আলোচনায় প্রবেশ করছি।"

তৃতীয় ভুল: হুজ্জাহ/প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা

আরেকটি ভুল হলো কোনো ব্যক্তির কাছে হুজ্জাহ/প্রমাণ পৌঁছানো এবং কোনো ব্যক্তির দ্বারা সেই হুজ্জাহ/প্রমাণ বোঝা—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য না বোঝা। অনেক গবেষক বড় শিরকের বিষয়গুলোতে ভুলভাবে এই দুটিকে এক করে ফেলেছেন।

অতএব, কোনো গবেষক যখন আলিমদের গ্রন্থে "কোনো ব্যক্তির কাছে হুজ্জাহ পৌঁছানো" কথাটি পড়েন, তখন তিনি ভুলভাবে মনে করেন যে আলিমদের বক্তব্য হলো—হুজ্জাহ অবশ্যই ব্যক্তির কাছে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ তাকে অবশ্যই বুঝিয়ে বলতে হবে যে সে শিরক করছে। এরপর সে যদি অহংকার করে এবং নিজের শিরকের ওপর অব্যাহত থাকে, তখনই সে কাফির হবে।

ফলে এই মতের প্রবক্তা এমন একজন অজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাপারে বলে: "সে শিরকে আকবর করছে, কিন্তু সে মুশরিক নয়; বরং সে মুসলিম।"

এভাবে তারা উসূলুদ-দ্বীনের বিষয় হোক কিংবা গোপন বিষয় হোক, সব ক্ষেত্রেই হুজ্জাহ বোঝাকে তাকফিরের শর্ত বানিয়ে দেয়। তারা মনে করে এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর আক্বীদাহ। অথচ পূর্ববর্তী আলিমদের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার কারণে তারা যে অবস্থানে পৌঁছেছে, এটি তাদের একটি বড় ভুল।

এটিও একটি গুরুতর ভুল। কারণ অনেক গবেষক কারও ওপরই তাকফির প্রয়োগ করেন না যদি না সে ব্যক্তি মুখে ইসলামকে অস্বীকার করে। বিদআতীদের প্রচলিত বক্তব্য হলো: "আমরা কেবল অহংকার ও অস্বীকারের কারণে তাকফির করি।" তারা মনে করে এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর মত। অথচ বাস্তবে এটি জাহমিয়্যাহদের বক্তব্য—আল্লাহ আমাদের তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

আলিম আবু বুতাইন رحمه الله বলেন: "সুতরাং যদি সে ব্যাক্তি অজ্ঞতার ওজর পায় যে ব্যক্তি বড় শিরক করে, তাহলে কে এমন ব্যক্তি, যে ওজরপ্রাপ্ত নয়?" এই মতের অনিবার্য ফল হলো—অস্বীকারকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কারও ওপর আল্লাহর হুজ্জাহ নেই। কিন্তু এই মত লালনকারীর সমর্থনে তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই।

বরং সে এই আক্বীদাহ রাখতে পারবে না। কারণ সে যদি এমন আক্বীদাহ রাখে, তাহলে সে কীভাবে এমন ব্যক্তিকে কাফির বলবে যে নবী ﷺ সম্পর্কে সন্দেহ করে? অথবা যে পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ করে? কিংবা উসূলুদ-দ্বীনের এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে সন্দেহ করে? কারণ সন্দেহ করাও তো অজ্ঞতা!

ফুকাহাগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) মুরতাদ সম্পর্কে বলেন: "আর মুসলিমের জন্য, যাকে ইসলাম গ্রহণের পর যে কারণে কাফির সাব্যস্ত হয়, তা হতে পারে কোনো কথা (যা সে বলে), কোনো কাজ (যা সে করে), কোনো সন্দেহ (যা সে সন্দেহ করে), অথবা কোনো বিশ্বাস (সে এমন কিছু বিশ্বাস করে যা তাকে কাফির বানায়া)। আর তার সন্দেহের কারণ হলো অজ্ঞতা।

কিন্তু উল্লিখিত ভুল মত অনুযায়ী, তাহলে অনিবার্যভাবে আমাদের ইহুদি, খ্রিস্টান, সূর্য-চন্দ্র ও মূর্তি-উপাসকদের অজ্ঞতার কারণে তাকফির করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এমনকি আলী ইবনে আবি তালিব رضي الله عنه যাদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে—কারণ তারাও অজ্ঞ ছিল!

অথচ আলিমগণ ইজমার ভিত্তিতে এমন ব্যক্তিকে কাফির বলেছেন, যে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাফির মনে করে না অথবা তাদের কুফর সম্পর্কে সন্দেহ করে। আর আমরা ধরে নিলাম যে তাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ ছিল।

শায়খ তাকিউদ্দীনও বলেছেন: "যে ব্যক্তি সাহাবিদের গালি দেয়, অথবা বিশ্বাস করে যে আলী رضي الله عنه উপাস্য কিংবা নবী ছিলেন, অথবা বিশ্বাস করে যে জিবরাইল আঃ ওহি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন—সে নিঃসন্দেহে কাফির। বরং যে ব্যক্তি তাকে কাফির বলে না, তার কুফর সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ নেই।

আর যে ব্যক্তি মনে করে যে রাসূল -ﷺএর পরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সাহাবিরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন, অথবা তারা ফাসিক হয়ে গিয়েছিলেন—

এমন ব্যক্তির কুফর সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ নেই। বরং যে ব্যক্তি তার কুফর সম্পর্কে সন্দেহ করে, সে নিজেই কাফির।"

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই মত পোষণকারীরা এমন মানুষ, যারা পড়াশোনা ও ইবাদত করে। কিন্তু তাদের এই মতের কারণ হলো তাদের অজ্ঞতা। আল্লাহ কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেন যে তারা তোমার দাওয়াত সম্পর্কে সন্দেহে ছিল এবং পুনরুত্থান সম্পর্কেও সন্দেহ করত। তাই তারা রাসূলদের বলেছিল: "নিশ্চয়ই তোমরা আমাদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছো সে সম্পর্কে আমরা গভীর সংশয়ের মধ্যে আছি।" এবং:

"নিশ্চয়ই তারা কুরআন সম্পর্কে গভীর সংশয়ের মধ্যে রয়েছে।"

আল্লাহ আরও বলেছেন যে মুশরিকরা বলেছিল:

"আমরা জানি না কিয়ামত কী। আমরা শুধু ধারণাই করি এবং আমরা নিশ্চিত নই।"

আর কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদের বন্ধু বানিয়েছিল, অথচ তারা মনে করত যে তারা সঠিক পথে রয়েছে।"

আল্লাহ আরও বলেন: "বলুন, আমি কি তোমাদের এমন লোকদের সম্পর্কে সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক থেকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হলো এমন লোক, যাদের দুনিয়াবি জীবনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

আল্লাহ তাদের অজ্ঞও বলেছেন। যেমন তিনি বলেন: "তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না; তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না;

তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট। তারাই হলো উদাসীন।"

আল্লাহ অন্ধ অনুসরণকারীদেরও নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন:

"বরং তারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের একটি ধর্মের ওপর পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সঠিক পথপ্রাপ্ত।''

তবুও তাদের অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের কাফির সাব্যস্ত করেছেন। আর আলিমগণ এই আয়াতগুলোকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চেনার/জানার মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে অন্ধ অনুসরণ বৈধ নয়।

আর আল্লাহর হুজ্জাহ মানুষের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের কাছে রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে—যদিও তারা আল্লাহর হুজ্জাহ এবং তার নিদর্শনগুলো বুঝতে না পারে।" — الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين।

শায়খ আবু বুতাইন رحمه الله আরও বলেন: "প্রত্যেক মাযহাবের আলেমগণ এমন বহু কথা, কাজ ও বিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন—যার কোনোটি করলে ব্যক্তিকে কাফির বলা হয়; এবং তারা এটিকে কেবল জেদি/অস্বীকারকারী ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি। অতএব যে ব্যক্তি দাবি করে যে কুফর সংঘটনকারী ব্যক্তি তাওয়ীলকারী, ভুলকারী মুজতাহিদ, অন্ধ অনুসরণকারী অথবা অজ্ঞ হওয়ার কারণে ওযরপ্রাপ্ত—সে নিঃসন্দেহে কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধিতা করেছে।

এছাড়াও তাকে তার নিজের মূলনীতিই খণ্ডন করতে হবে। কারণ সে যদি তার সেই মূলনীতি সর্বত্র প্রয়োগ করে, তাহলে সে নিজেই নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে—যেমন, কেউ যদি মুহাম্মাদ -ﷺএর রিসালাত নিয়ে সন্দেহকারী ব্যক্তিকে কাফির বলার ব্যাপারে বিরত থাকে—ইত্যাদি।”– الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين , পৃষ্ঠা ৪৬

এ বিষয়ে অন্যান্য আলিমের বক্তব্য

ইসহাক ইবনে আবদুর রহমান رحمه الله বলেন: ”আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং আমরা শুনেছি যে , এমন একটি গোষ্ঠী আছে যারা নিজেদেরকে ইলম ও দ্বীনের অনসুারী বলে দাবি করে এবং বলে যে তারা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের মানহাজ অনসুরণ করে। অথচ তারা বলে যে , যারা আল্লহ্-র সাথে শিরক করে ও মূর্তিপূজা করে, তাদেরকে নির্দিষ্ট করে কুফর ও শিরকের (কাফির মুশরিক) ফাতাওয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে আমি নিজ কানে তাদের একজনকে বলতে শুনেছি —যখন তাদের এক ভাই একজন ব্যক্তিকে শিরক ও কুফরের অপরাধে অভিযুক্ত করল, কারণ সে নাবী ﷺ-এর নিকট দআু করছিল এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছিল—তখন সে লোকটি তাকে বলল: “তুমি তাকে কাফির বলে ফাতাওয়া দিও না, যতক্ষণ না তুমি তাকে তা‘রীফ (অর্থাৎ, তাকে জানিয়ে দাও যে এই কাজটি শিরক ও কুফর) করো, এবং তার উপর হুজ্জাহ কায়েম না করো।” – حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

ইসহাক رحمه الله এরপর বলেন: "শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله-এর চিঠিপত্র এবং তাঁর সন্তানদের চিঠিপত্র অনুসন্ধান করো। এগুলো তোমাদের এসব সন্দেহের উত্তর স্পষ্ট করে দেবে, যেমন আমরাও তা স্পষ্ট করব। কারণ অল্প জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যখন বর্তমান সময়ের মানুষের অবস্থা এবং পূর্ববর্তী আলিমদের বক্তব্য দেখে, তখন সে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর সাহায্য ও শক্তি ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। নিশ্চয়ই, কিছু ব্যক্তি যারা এ বিষয়ে গবেষণা করেছে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতকারী ব্যাক্তি সম্পর্কে বলেছে: 'হয়তো সে শিরক করছে, কিন্তু সে মুশরিক নয়।' কী আশ্চর্য ব্যাপার এটি! সুতরাং তোমার রবের প্রশংসা করো এবং তাঁর কাছে সুস্থতা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই এই বক্তব্য ইরাকির (দাউদ ইবনে জারজিসের) বক্তব্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যার খণ্ডন শায়খ আবদুল লাতিফ করেছেন।

আর যে ব্যাক্তি আমার সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছে সে বলেছে, কিছু ছাত্র তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন সে উত্তর দিয়েছিল: 'আমরা তার শিরকের ওপর তাকফির করি, কিন্তু যে ব্যক্তি শিরক করেছে তার ওপর তাকফির করি না, যতক্ষণ না তাকে তা'রীফ (অর্থাৎ, তার কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং তার ওপর হুজ্জাহ কায়েম করা) করা হয়।"

আর আমরা তার উপর নির্ভর করি যা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের কিছু চিঠিতে যা দেখতে পাই, যেখানে তিনি কালওয়াজ ও আবদলু কাদিরের গম্বজু বা মাজারের ইবাদাতকারীদের মধ্যে কিছু জাহিলদের তাকফির থেকে বিরত থেকেছেন—কারণ সেখানে তাদেরকে সতর্ক করার মতো কেউ ছিল না।" কী

আশ্চর্য ব্যাপার! আল্লাহর কাছে সুস্থতা এবং তাঁর হেফাজত প্রার্থনা করো।” – حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

শায়খ ইসহাক رحمه الله এখানে তাদের খণ্ডন করছেন যারা মুশরিকদের ওজর দেওয়ার সময় শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের নামের আড়ালে আশ্রয় নেয়। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله তাদের এই অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাদের ভুল বোঝা যুক্তি –“তিনি কালওয়াজ ও আবদলু কাদিরের গম্বজু বা মাজারের ইবাদাতকারীদের মধ্যে কিছু জাহিলদের তাকফির থেকে বিরত থেকেছেন—কারণ সেখানে তাদেরকে সতর্ক করার মতো কেউ ছিল না।”– ছিল তাদের বিকৃত মন্তব্যের কারণ। আর তারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের অন্যান্য বক্তব্যের আলোকে এই বক্তব্যটি বিচার করেনি। ফলে তারা সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা না করে এটিকে দ্বীনের অংশ বানিয়ে নিয়েছে এবং এটিকেই গ্রহণ করেছে এবং মনে করছে তারা সত্য পথে রয়েছে।

ইসহাক رحمه الله বলেন: “এইসব সন্দেহের মাধ্যমে তারা তাদের অনসুারী সাধারণ অজ্ঞ মূর্খ, বিচারহীন মানষুদের ধোঁকা দিয়েছে —যারা তাদের নিজেদের অবস্থা বোঝে না, পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম এবং বোঝার ক্ষমতাও রাখে না। তারা এমন সব লোক, যারা শারীরিকভাবে (হক্বপন্থী) ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে, তাদের অন্তর হকপন্থী মাশাইখদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে, এবং তারা মুশরিকদের সাথে মদুাহানাহ (তোষামোদকারী, দ্বীন বিক্রি করে বন্ধুত্ব স্থাপন) করেছে। তারা (হক্বপন্থীদের) পরিত্যাগ করেছে এবং তারাও

(হক্বপন্থীদের পক্ষ থেকে) পরিত্যক্ত হয়েছে —তাদের মনে দেখা দেওয়া সংশয় এবং ফাসিক্ব ও মুশরিকদের সাথে ঘনিষ্ঠতাজনিত হতাশার কারণে। যখন তাদের অবস্থা খেয়াল করা হয়, দেখা যায় তারা মুশরিকদেরকে তাকফির করে কেবল সাধারণভাবে (তাকফির
মুতলাক), অথচ পরস্পরের মধ্যে স্পষ্ট তাকফির বা তাকফির মুআয়্যিন করতে তারা বিরত থাকে। এরপর তাদের
বিদ'আহ ও সংশয় ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা কিছু সম্মানিত ভাইদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লহ্'ই
উত্তমভাবে জানেন—তাদের পতনের প্রধান কারণ হলো উসূলের কিতাবসমহূ থেকে মখু ফিরিয়ে নেওয়া, সেগুলোর প্রতি
উদাসীনতা, এবং যাইগ (বিপথগামিতা)-এর মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয় না থাকা।
حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة—

তিনি আরও বলেন: "আমরা যে শুবহাতটির কথা উল্লেখ করেছি, তা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব-এর সময়েও কিছু মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যার মধ্যে এই শুবহাত দেখা দিত, সে বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে সেটি সমাধানের চেষ্টা করত। কিন্তু আমরা যাদের কথা উল্লেখ করেছি, তারা এটিকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনাই করেনি। বরং তারা এই শুবহাতকেই দ্বীনের অংশ বানিয়ে নিল। তারা সাধারণভাবে মুশরিকদের এমন লোক হিসেবে বিবেচনা করতে লাগল, যাদের আগে (ইসলামিক) ব্যাখ্যা করে বোঝানো প্রয়োজন (তাকফির করার আগে)। আর যে ব্যক্তি তাদের বিরোধিতা করতো, তাকে তারা অজ্ঞ বলে অভিহিত করতো। এভাবে তারা নিজেদের সংশোধন করল না···

হে আমাদের রব! হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিয়ো না। আল্লাহ মহান!

কত অসংখ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি রয়েছে অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না!" — حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

তারা যদি নাজদের আলিমদের কাছে ফিরে যেত, তাহলে তারা এই শুবহাতটির—অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতকারী ব্যক্তির তাকফিরের ব্যাপারে—এবং অন্যান্য গ্রহণ করা শুবহাতেরও উত্তর জানতে পারত। আর এটাই তাদের সমস্যা। তারা এমন কিছু ছাত্রের বই অনুসরণ করে, যারা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে; কিন্তু তারা তাদের বড় আলিম মনে করে। ফলে তারা অতীতের বড় আলিমদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া ভুলে যায়।

আর যখন তারা পূর্ববর্তী আলিমদের বইয়ের দিকে তাকায়, তখন তারা আধুনিক কিছু বইয়ের—যেগুলো মুশরিকদের জন্য ওজর গ্রহণ করে—দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই পুরোনো বইগুলো পড়ে। ফলে তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর প্রকৃত অর্থ ভুল বোঝে।

আর দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আজ আকীদাহর অনেক কথিত বিশেষজ্ঞই প্রাচীন আলিমদের বিরোধিতা করছেন। ফলে আজ কোনো ছাত্র যখন আকীদাহর কোনো বিষয় সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করে, তখন তারা অজ্ঞতাবশত তাকে পথভ্রষ্ট করে।

শায়খ আবদুল লাতিফ যেমন বলেছেন: ‘সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। কী আশ্চর্যভাবে এই দ্বীন অপরিচিত হয়ে গেছে! আর কত অল্পসংখ্যক মানুষই এটিকে বোঝে…’
এত স্পষ্ট বার্তাসম্পন্ন একটি দ্বীনে এমন সমস্যা কীভাবে দেখা দিতে পারে—দুর্বল বুদ্ধি ও নষ্ট লোকদের মাধ্যম ছাড়া?”

এখন আমরা এই ভ্রান্তির উৎসে ফিরে আসি—আর তা হলো হুজ্জাহ পৌঁছানো এবং হুজ্জাহ বোঝার মধ্যে পার্থক্য না করা। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন এবং যারা এটি ভুল বুঝেছিল তাদের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উসূলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে হুজ্জাহ কুরআন পৌঁছানোর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়; কুরআনকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝানো এর শর্ত নয়। কারণ উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়গুলোতে কুরআন নিজেই ব্যাখ্যাকারী[7] —এই শর্তে যে, হুজ্জাহ (কুরআন) তাদের ভাষায় তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে (যেন তারা পড়তে বা শুনতে পারে)।”
আর তিনি রাসাইল আশ-শাখসিয়্যাহ পৃষ্ঠা ২২৪-এ বলেছেন:
“ভাইদের প্রতি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।
অতঃপর: তোমরা শায়খ ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله-এর বক্তব্য থেকে যা উল্লেখ করেছ—‘যে ব্যক্তি অমুক অমুক কথা বলেছে এবং তার ওপর হুজ্জাহ

[7] “আর এটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে: ‘আমরা কেবল তার উপরই তাকফির করি, যার ওপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’ আর অন্য একটি বক্তব্যে তিনি বলেছেন: ‘হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (তার ওপর)’ এবং ‘হুজ্জাহ পৌঁছার পর (তার কাছে)’—এ ধরনের আরও বক্তব্য। এর অর্থ হলো, তার কাছে তার নিজস্ব ভাষায় কুরআন পৌঁছে যাওয়ার পর।”

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে’—এবং তোমরা এই ত্বগুত ও তাদের অনুসারী (উপাসকদের) ব্যাপারে সন্দেহ করছ যে, তাদের ওপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না—এটি সত্যিই আশ্চর্যজনক!

তোমরা কীভাবে এ ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারো, যখন আমি ইতিপূর্বেই তোমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছি?

যার ওপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে হলো—যে ব্যক্তি নতুনভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে, অথবা যে দূরবর্তী কোনো বিচ্ছিন্ন স্থানে বসবাস করে;[স্পষ্ট বিষয়/মাসাইল আয-যুহিরহ এর ক্ষেত্রে।–অনুবাদক] অথবা গোপন/সূক্ষ্ম বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেমন আস-সারফ ওয়াল-আতফ। এমন ব্যক্তিকে সে বিষয় জানানো না পর্যন্ত কাফির সাব্যস্ত করা হবে না। কিন্তু উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়গুলো—যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে স্পষ্ট করেছেন—সেখানে আল্লাহর হুজ্জাহ হলো কুরআন।

অতএব যার কাছে কুরআন পৌঁছেছে, তার কাছে হুজ্জাহ পৌঁছেছে। কিন্তু তোমরা হুজ্জাহ কোনো ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো এবং তাকে হুজ্জাহ ব্যাখ্যা করে বোঝানোর মধ্যে পার্থক্য করছ না।

নিশ্চয়ই অধিকাংশ কাফির এবং মুসলিমদের মধ্যকার মুনাফিকরা আল্লাহর হুজ্জাহ তাদের কাছে পৌঁছানো সত্ত্বেও তা বোঝে না। যেমন আল্লাহ বলেছেন:‘আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট।’ সূরা আল-ফুরকান ২৫:৪৪

আর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। তাদের কাছে হুজ্জাহ পৌঁছানো এক ধরনের, আর তাদের তা বোঝা আরেক ধরনের। আর তাদের কুফর হুজ্জাহ তাদের কাছে পৌঁছার কারণেই হয়, যদিও তারা তা বুঝতে না

পারে—অর্থাৎ তারা শব্দ ও ভাষা বুঝতে পারে, কিন্তু গভীর অর্থ বুঝতে পারে না।”

সুতরাং শায়খ অজ্ঞ ব্যাক্তিদের কাছে ব্যাখ্যা করছেন যে, উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়গুলোতে হুজ্জাহ আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হবে না।

শায়খ ইসহাক বলেছেন: “আমাদের বিষয় হলো—আল্লাহর সঙ্গে কোনো অংশীদার না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য কারও ইবাদত করার ব্যাপারে আমরা নিজেদের সম্পর্কমুক্ত ঘোষণা করা (তাকফির করা)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, সে বড় শিরক করেছে, যা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এটাই মৌলিক নীতি (ইসলামের); আর এই বার্তার জন্যই আল্লাহ রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাজিল করেছেন। অতএব রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে মানুষের ওপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই মৌলিক নীতির ক্ষেত্রে—যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে তার তাকফিরের ব্যাপারে—এই দ্বীনের আলিমদের কাছ থেকে তুমি যে উত্তর পাবে তা হলো: সে তওবা করলে তো ভালো; আর তওবা না করলে তাকে হত্যা করা হবে।

তাদের কেউই এর জন্য উসূলুদ-দ্বীন বোঝাকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেননি। বরং তারা বোঝাকে কেবল গোপন/সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন—যেসব বিষয়ে কিছু মুসলিমের কাছে প্রমাণ পৌঁছানো নাও হয়ে থাকতে পারে; যেমন কাদারিয়্যাহ ও মুরজিয়াহর বিদআতপন্থীদের সঙ্গে মতবিরোধপূর্ণ কিছু বিষয়, অথবা আস-সারফ ওয়াল-আতফের মতো বিষয়।

আর কবরপূজারীরা কীভাবে (উসূলুদ-দ্বীন বোঝার শর্তের আওতায়) আসবে, যখন তারা তো মুসলিমই নয়? আল্লাহর সঙ্গে শিরক থাকা অবস্থায় কোনো ইবাদত কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, যখন আল্লাহ বলেছেন:

‘তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্রে প্রবেশ করে।’ — ৭:৪০

‘আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সঙ্গে কোনো শরিক না করে…’ — ২২:৩১

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না; আর তার থেকে ছোট যাবতীয় গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।’ — ৪:১১৬

‘আর কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম অবশ্যই নিস্ফল হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষীতগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ’ — ৫:৫

এ ধরনের আরও আয়াত রয়েছে। অতএব (অজ্ঞ মুশরিকদের) ওজর দেওয়া এমন বলার মতো যে, রাসূল ও কুরআন পৌঁছানোর মাধ্যমে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[৪] আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এমন বোঝার অভাব থেকে, যার কারণে তারা কিতাব ও রাসূলকে ভুলে গেছে।

বরং আহলুল-ফিতরাহ হলো তারা, যাদের কাছে তাওহীদের বার্তা ও কুরআন পৌঁছেনি এবং যারা এই অজ্ঞতার অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। আলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী তাদের মুসলিম গণ্য করা হয় না এবং আমরা তাদের জন্য

---

[৪] কবরপূজারী এবং যাদের তাকফির প্রাপ্য, তাদের তাকফির না করা ব্যক্তির এই ভ্রান্ত মতটির প্রতি লক্ষ্য করো। প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত মতগুলোর মধ্যে এটিও রয়েছে যে, এমনকি ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও কাফির নয়।

শায়খ সুলাইমান ইবনে সাহমান رحمه الله বলেছেন: ‘আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন যে, বহু কাফির প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ; তবুও আল্লাহ তাদের কাফির ঘোষণা করেছেন। আর আমরা আজকের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অজ্ঞ অন্ধ অনুসারী হিসেবে দেখতে পাই। তা সত্ত্বেও তারা কাফির; আর যে ব্যক্তি তাদের কুফর সম্পর্কে সন্দেহ করে, সেও (কাফির)।’— الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق, পৃষ্ঠা ৩৭৪।

ক্ষমাপ্রার্থনাও করি না; বরং তাদের আখিরাতের শাস্তির ব্যাপারেই শুধু আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।” — حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

এরপর আবু বুতাইন رحمه الله তার কিছু চিঠিপত্রে বলেন: “কুরআন প্রমাণ করেছে যে উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়গুলোতে সন্দেহ করা কুফর। আর সন্দেহ হলো দুটি বিষয়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত থাকা। যেমন—যে ব্যক্তি সন্দেহ করে যে নবী ﷺ সত্যবাদী না কি মিথ্যাবাদী; অথবা পুনরুত্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়; কিংবা এ ধরনের অন্যান্য বিষয়—যেমন সালাত ওয়াজিব কি না, অথবা যিনা হারাম কি না—এসব নিয়ে সন্দেহ করা। আলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী এটি কুফর। আর এসব বিষয় না বোঝার কারণে এমন ব্যক্তির কোনো ওজর নেই। কারণ এসব বিষয়ের বিধান তার কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর তার জন্য কোনো ওজর নেই, যদিও সে তা বুঝতে না পারে।”

খেয়াল করুন, আলিমগণ কীভাবে একজন ব্যক্তির কাছে হুজ্জাহ পৌঁছানো—যাকে তারা কখনো কখনো কুরআন পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বলেছেন—এবং হুজ্জাহ বোঝার অর্থাৎ ব্যক্তির কাছে প্রমাণ ব্যাখ্যা করে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। উসূলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট যে, একজন ব্যক্তির কাছে কুরআন পৌঁছানোই যথেষ্ট; আর গোপন/সূক্ষ্ম বিষয়ের ক্ষেত্রে হুজ্জাহ ব্যাখ্যা করে বোঝানো প্রয়োজন। কিন্তু তাদের সমস্যা হলো, তারা এই দুটিকে এক করে ফেলেছে। ফলে বাস্তবে রাসূল ও কুরআনই যেহেতু দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর—অর্থাৎ তাওহীদের—হুজ্জাহ, সেক্ষেত্রেও তারা প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বোঝানোকে শর্ত বানিয়েছে। অথচ তারা ভুলভাবে বলেছে যে এ

বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; বাস্তবে তারাই পূর্ববর্তী মহান আলিমদের বিরোধিতা করেছে।"

শায়খ আবু বুতাইন رحمه الله বলেছেন: "রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের ওপর আল্লাহর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও মানুষ তা এবং তার নিদর্শনগুলো বুঝতে না পারে।" – الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين।

আর শায়খ ইসহাক رحمه الله বলেন: "এর অর্থ হলো, রাসূল ও কুরআনের মাধ্যমে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, যে ব্যক্তি রাসূলের কথা শোনে এবং/অথবা যার কাছে কুরআন পৌঁছেছে, তার ওপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। শায়খুল ইসলাম-এর কথায় এটি স্পষ্ট, যখন তিনি বলেছেন যে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তিকে আবু বকর আস-সিদ্দীক رضي الله عنه-এর মতো করে তা বুঝতে হবে। বরং সে যদি কুরআন ও সুন্নাহর কোনো কথা শোনে, অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সে কাফির।

নিশ্চয়ই সকল কাফির একই হুজ্জাহ পেয়েছিল, আর তা হলো কুরআন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন: 'নিশ্চয় আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি' — ১৮:৫৭

অতএব, এ বিষয়ে চিন্তা করো, গভীরভাবে ভাবো এবং আল্লাহর কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করো।

এগুলো এমন তিনটি দৃষ্টান্ত, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উসূলুদ-দ্বীনের বিষয়গুলোতে কুরআনের মাধ্যমে—যে ব্যক্তি তা নিজের ভাষায় শোনে তার

ওপর—হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যদিও সে তার ব্যাখ্যা বুঝতে না পারে। আর এটি—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য—প্রত্যেক সেই মুসলিমের বিশ্বাস, যে কুরআন শোনে। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান অধিকাংশ মানুষকে তাদের ফিতরাত—তাওহীদের স্বাভাবিক প্রবণতা—থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।" — حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব বলেন رحمه الله, আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! হে আমার ভাইয়েরা! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মূলভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। এর শুরু ও শেষ, এর ভিত্তি ও শীর্ষ হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। এর অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন করো, একে ভালোবাসো, এর অনুসারীদের ভালোবাসো এবং তাদেরকে তোমাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করো যদিও তারা দূরবর্তী হয়। ত্বগুতদের অস্বীকার করো, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করো, তাদেরকে ঘৃণা করো; আর তাকেও ঘৃণা করো যে তাদের ভালোবাসে, তাদের পক্ষে তর্ক করে, তাদেরকে কাফির বলে না, অথবা বলে; তাদের ব্যাপারে আমার কিছু যায় আসে না কিংবা বলে, আল্লাহ আমাকে তাদের বিষয়ে দায়িত্বশীল করেননি।
নিশ্চয়ই সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে ও তাঁর প্রতি অপবাদ দিয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের বিষয়ে দায়িত্বশীল করেছেন এবং তাদেরকে অস্বীকার করা ও তাদের থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ করা তার উপর ফরজ করেছেন, যদিও তারা তার আপন ভাই বা সন্তানই হোক। — আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ২/১১৯–১২০